তারিখ 14 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক
আমাদের সময়

স্বেচ্ছাচারী কিন্ডারগার্টেন

এম এইচ রবিন ●

উত্তরার একটি কিন্ডারগার্টেনের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী অদ্রি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নির্ধারিত ছয়টি পাঠ্যপুস্তকসহ তার ক্লাসের বইয়ের সংখ্যা ১৬টি। বাকি বইগুলো বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত অতিরিক্ত পাঠ্যতালিকাভুক্ত। এসব অতিরিক্ত বই প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ড বইয়ের বাইরেও শিশুদের পড়ানো হয়। ফলে অতিরিক্ত বইয়ের বোঝায় ব্যাগ ভারী হয় শিক্ষার্থীদের আর ব্যবসা বাড়ে কিন্ডারগার্টেন স্কুলের মালিকের।

> শিশুদের ওপর চাপানো হচ্ছে বইয়ের বোঝা
> অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষার চাপ
> ইচ্ছামতো নেওয়া হচ্ছে বেতন-ফি

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন সমিতির তথ্যানুযায়ী, দেশে প্রায় ৫০ হাজারের বেশি কিন্ডারগার্টেনে পড়ালেখা করছে এক কোটি শিশু। শহর অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসনসংখ্যা সীমিত হওয়ায় অভিভাবকদের একমাত্র ভরসা বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন। কিন্তু স্বস্তি মিলছে না সেখানেও। সরকার শিশুদের অবস্থা বিবেচনা করে একটি কিন্ডারগার্টেন নীতিমালা করেছে। এর মাধ্যমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে স্কুলগুলোকে নিবন্ধন নিতে বলা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কখনই আগ্রহ দেখায়নি কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। এদিকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখভালের জন্য কোনো মনিটরিং ব্যবস্থাও নেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের। ফলে নিজেদের ইচ্ছামতো চলছে দেশের প্রায় ৫০ হাজারের বেশি কিন্ডারগার্টেন। এসব অবকাঠামোহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থার জন্য সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ নেই। এক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি প্রবাদ হচ্ছে– 'কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই'।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দেশের বেশিরভাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নেই শিক্ষার পরিবেশ। দু-তিনটি কক্ষে ছোট-ছোট খুপরি বানিয়ে চলছে এসব স্কুল। আবার কোথাও একটি রুমেই পরিচালিত হচ্ছে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। গাদাগাদি হয়ে পাশাপাশি টেবিলে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির। এর ফলে কোনো ক্লাসেই ঠিকমতো পাঠদান হয় না। অথচ পরীক্ষা নিতে সিদ্ধহস্ত এসব স্কুল– সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক। এসব পরীক্ষায় ইচ্ছামতো ফি নেওয়া হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে। শুধু পরীক্ষার ফি-ই নয়, বেতনের ক্ষেত্রেও কোনো নীতিমালা নেই এসব স্কুলে। এ ছাড়া বার্ষিক ভর্তি ফিসহ নানা খাত দেখিয়ে বছরে একটি মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয় অভিভাবকদের। এদিকে এত টাকা নিলেও ক্লাসে সঠিক শিক্ষা পায় না কোমলমতি শিশুরা। শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস করাতে না পারলেও ব্যস্ত থাকেন টিউশনিতে। এভাবে মাসের পর মাস অভিভাবকদের গুনতে হয় কাঁড়ি-কাঁড়ি অর্থ।

রাজধানীর সূত্রাপুরের কাগজিটোলায় প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ বর্গফুটের রুমে চলছে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। এখানে তিনটি টেবিলে পড়ানো হয় প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের। অন্য তিনটি টেবিলে বসে প্রথম শ্রেণির শিশুরা। অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও বসে গাদাগাদি করে। ছোট্ট দুটি ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে। বসার জায়গা নেই শিক্ষকদের। দরজার সামনে বসে থাকেন

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

স্বেচ্ছাচারী কিন্ডারগার্টেন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অভিভাবকরা।

এ স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মো. আবদুল আজিজ জানান, বাসায় সারাদিন চার দেয়ালে বন্দি থাকে শিশুরা। স্কুলেও একই অবস্থা। পড়ার ফাঁকে একটু যে দৌড়াদৌড়ি করবে, সে জায়গাটুকুও নেই। অতিরিক্ত পাঠ্যবই প্রসঙ্গে আরেক অভিভাবক অহিদুল ইসলাম জানান, স্কুল থেকে তার সন্তানের জন্য যে পড়া দেওয়া হয়, তা তৈরি করতে দিন ও রাতের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। অনেক চাপের কারণে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে চায় না। তাই আগামী বছর সন্তানকে অন্য স্কুলে দেওয়ার চিন্তা করছেন। তিনি বলেন, কিন্তু যে কটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে খোঁজ নিয়েছি সবগুলোর অবস্থা একই। এখন করণীয় নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেন, নীতিমালা প্রণয়নের পর আমরা কিন্ডারগার্টেনগুলোকে তাগিদ দিচ্ছি। উৎসাহিত করছি একটি পদ্ধতির মধ্যে আসতে। এতে কাজ না হলে আমরা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ আমাদের সময়কে বলেন, বেশিরভাগ কেজি স্কুল বৈধভাবে গড়ে ওঠেনি। এসব স্কুলের আদৌ প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাও আমরা জানি না। তাই টাস্কফোর্স গঠন করা হচ্ছে শিগগির। টাস্কফোর্স এসব স্কুলের পরিসংখ্যান তৈরি করবে। এ ছাড়া এসব স্কুলে কী পড়ায়, সরকারি বই পড়ায় কিনা, শিক্ষকদের যোগ্যতা কেমন, কী প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, কেমন বেতন-ভাতা নেয়, কোন-কোন খাতে অর্থ আদায় করে, স্কুল প্রতিষ্ঠায় অর্থের উৎস কী, আয়ের অর্থ কোথায় ব্যয় হয়, ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবিধান মানে কিনা ইত্যাদি খোঁজখবর নেবে। এরপর তারা সুপারিশ করবে। মূলত উচ্ছেদের আগে আইনি ভিত্তি প্রয়োজন। সেজন্যই এই টাস্কফোর্স। টাস্কফোর্সের সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবে।

তিনি আরও বলেন, যেখানে যে কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে, সেখানে সেটা রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, টাস্কফোর্স সে বিষয়েও সুপারিশ করবে। অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধের ব্যবস্থা নেবে সরকার।

এদিকে কিন্ডারগার্টেন স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, তারা কীভাবে নিবন্ধন নেবে? নিবন্ধন নীতিমালায় নানা কঠোর শর্ত রাখা হয়েছে। এসব পূরণ করে নিবন্ধন নেওয়া সম্ভব নয়।

নীতিমালায় যা রয়েছে : প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব মালিকানা অথবা ভাড়ায় মহানগর এলাকায় অন্তত ৮ শতাংশ, পৌর এলাকায় অন্তত ১২ শতাংশ ও অন্যান্য এলাকায় ৩০ শতাংশ ভূমি এবং এই ভূমির ওপর অন্তত তিন হাজার বর্গফুটের কমপক্ষে ছয় কক্ষের ভবন থাকতে হবে। ভাড়া নেওয়ার প্রমাণ হিসেবে লিখিত চুক্তি দেখাতে হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনজন মহিলা শিক্ষকসহ কমপক্ষে ছয়জন শিক্ষক থাকতে হবে। জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একজন, অভিভাবকদের মধ্যে নির্বাচিত দুজন, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বা মনোনীত তিনজন এবং পাশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে নিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। মহানগর এলাকার জন্য ৫০ হাজার, জেলা সদর ৩০ হাজার, উপজেলা সদর ও পৌরসভা ২৫ হাজার এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৫ হাজার টাকার নিজস্ব তহবিল থাকতে হবে। একই পরিমাণ অর্থ নিবন্ধনের জন্য জমা দিতে হবে। পাঠ্যক্রমবহির্ভূত কোনো বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমতি নিতে হবে।